ধারাবাহিক রচনা

দেবেন্দ্রনাথ : আঁধার পথে একলা পথিক

শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী

ব্রাহ্মসমাজের সম্মিলনের শেষ চেষ্টাও যখন ব্যর্থ হল তখন দেবেন্দ্রনাথ বিরোধ-বিবাদে ক্লান্ত অবসন্ন। শরীরও ভেঙে পড়ছে ক্রমশ। হিমালয়ের বরফগলা ঝরনার প্রচণ্ড ঠান্ডা জলে স্নান করে কানেও ভাল শুনতে পান না। চশমা পরেও ঝাপসা দেখেন বেশ। অবসাদ আর বিষাদ ঘেরা পরিবেশ ছেড়ে তিনি দূরে নির্জন প্রকৃতির বুকেই আশ্রয় নিতে চাইলেন। এরই মধ্যে ১৮৬৭ সালের নভেম্বর মাসে তাঁকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরা এক অভিনন্দনপত্র পাঠালেন, যাতে তাঁকে প্রথম 'মহর্ষি' সম্বোধন করা হল। এরপর থেকেই সাধারণ মানুষ এবং ব্রাহ্মধর্মের সভ্যদের কাছে তিনি মহর্ষি বা মহর্ষিদেব নামে পরিচিত হন।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ গেলেন অমৃতসর হয়ে লাহোরের রাওয়ালপিন্ডি। সেখান থেকে মারী হয়ে কাশ্মীর। আবার প্রায় দুবছরের বেশি হিমালয়ের বুকে নির্জন তপস্যা আর ব্রহ্মউপাসনা। ১৮৭০-এ কেশবচন্দ্র লন্ডন থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পর তিনিও ফিরে এলেন কলকাতায়। আবার দুই ব্রাহ্মসমাজের মিলনের প্রস্তাব পাঠালেন কিন্তু তাও ব্যর্থ হল। উপরন্তু ১১ মাঘের ভাষণে দেবেন্দ্রনাথ যা বললেন, কেশবচন্দ্রের দল তাতে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল : ''ধন্য কেশবচন্দ্রকে যে তিনি এই সমুদয় সাধুমণ্ডলী একত্রিত করিয়া ঈশ্বরের মহিমা কীর্তনের জন্য আমাদিগকে অবসর দিয়াছেন। সমুদ্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই। পর্বত তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই। পৃথিবীময় ব্রাহ্মধর্ম ঘোষণা করা তাঁহার ব্রত।''[১৮]

এই অবধি কোনও বিতর্কের মেঘ ছিল না কিন্তু পরবর্তী অংশে ঝঞ্ঝা বাতাস বইতে শুরু করল।

''... কিন্তু তাঁহাকে আমি এই অনুনয়পূর্বক বলিতেছি যে তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টকে না আনেন, এশিয়া ইউরোপের মধ্যবর্তী খৃষ্টকে না করেন। আত্মা পরমাত্মার মধ্যে খৃষ্ট ব্যবধান না হয়।... ব্রাহ্মধর্ম—স্বাধীনধর্ম; স্বাধীনতা রক্ষা না করিলে ব্রাহ্মধর্মের জীবন হইবে না। খৃষ্ট যেখানে, সেখান হইতে স্বাধীনতা পলায়ন করে। খৃষ্টের নামেতে বিগতবিবাদ ব্রাহ্মধর্ম হইতেও বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, সাম্প্রদায়িক ভাব সমুত্থিত হইয়াছে।''[১৯]

'যেতে যেতে একলা পথে'

এই বক্তব্যের পরে আর কোনওরকম দৌত্য চলে না। ১৮৭৩ থেকে আবারও পরিব্রাজকের

জীবন শুরু করলেন দেবেন্দ্রনাথ। পত্নীর গুরুতর অসুস্থতার কথা চিঠিতে জানতে পেরে ডালহৌসি পাহাড় থেকে নেমে এলেন। তবু সরাসরি কলকাতায় নয়, শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন ধ্যানমগ্ন থেকে শেষ দেখা দেখতে এলেন পত্নী সারদাসুন্দরী দেবীকে। ১০ মার্চ তাঁর জীবনাবসান হল। এর পরে আর দেবেন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন একসঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বাস করেননি। প্রায়শই চলে যেতেন হিমালয়ে; কিংবা ধ্যানস্থ থাকতেন শান্তিনিকেতনে ছাতিমতলায়। বোলপুরের শূন্য ধূসর প্রান্তরে সেই ছোট্ট গৃহটিকে ঘিরে আশ্রম নির্মাণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তিনি। অন্য জায়গা থেকে মাটি এনে গাছে গাছে ভরিয়ে তুললেন চারপাশ। রুক্ষতার বুকে সবুজ ছায়ায় ঘেরা আশ্রমটি তাঁর বড় প্রিয় হয়ে উঠল। সঙ্গে রইলেন বন্ধু শ্রীকণ্ঠ সিংহ আর তাঁর সুকণ্ঠের অপূর্ব গান।

দৃষ্টির স্বল্পতা সত্ত্বেও পাঠাভ্যাস ত্যাগ করেননি। পড়ছেন বারো খণ্ডের 'ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অফ রোমান এম্পায়ার'। সাহেবগঞ্জ বজরায় বসে পড়ে ফেলছেন ফরাসি দার্শনিক ভিক্টর কুজ্যাঁর লেখা প্রসিদ্ধ বই 'Le vrai le beau le bien'—মূল ফরাসিতে। অথচ ফরাসি তিনি জানেন না। ইংরেজি-ফরাসি অভিধানের সাহায্য নিয়ে এমন দুরূহ দার্শনিক বই পড়া যথেষ্ট অধ্যবসায়ের কাজ। পরবর্তী কালে তাঁর প্রিয় এই গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল'-এর এই আদর্শ হয়ে উঠবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদর্শনেরও মূলকথা।

কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে এবং আরও কিছু কারণে এইসময়েই ব্রাহ্মসমাজে আবার ভাঙন দেখা দিল। শিবনাথ শাস্ত্রী, শিবচন্দ্র দেব, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ হস্তক্ষেপ করলেন

সারদাসুন্দরী দেবী

না। পাহাড়ের কোলে প্রকৃতির মনোরম নির্জনতায় একান্তে ব্রহ্মের উপাসনা চালিয়ে গেলেন।

১৮৭৯-৮০ বারকোট আর দার্জিলিং-এ কাটিয়ে ১৮৮১-তে দেবেন্দ্রনাথ পৌঁছলেন দেরাদুনে। প্রায় বছর তিনেক তিনি ছিলেন দেরাদুন আর মুসৌরিতে। শারীরিক বিপত্তি প্রায় লেগেই ছিল। চিকিৎসাও চলছিল দেরাদুনে। ১৮৮৩-তে নেমে এলেন কাশীতে। আবার ফিরে চললেন বাঁকিপুর-গাজিপুর হয়ে মুসৌরির দিকে। পথে চিঠিতে জানতে পারলেন বড় জামাই সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ। রবীন্দ্রনাথের বিয়ের রাতেই দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় এই জামাতার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে শিলাইদহে। তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের চিনভ্রমণের সঙ্গী। বড় ভরসা করতেন তাঁকে। তাই ভাঙা মন নিয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়।

আচার্য দেবেন্দ্রনাথ

কয়েকদিন থেকেই চলে গেলেন চুঁচুড়ায়। গঙ্গাতীরে ওলন্দাজদের এক পুরোনো বাড়ি তাঁর থাকবার জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে সেখানেই শেষজীবনটা কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু একের পর এক মৃত্যুশোক তাঁকে আচ্ছন্ন করল। তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় 'ব্রহ্মানন্দ' কেশবচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করলেন। সেই ভয়াবহ আঘাতের ওপর আবার আঘাত এল তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে। চলে গেলেন তাঁর শেষ জীবনের সঙ্গী শ্রীকণ্ঠ সিংহ। বড় বেশি একা হয়ে গেলেন। বড় মেয়ে সৌদামিনী সেইসময় তাঁর সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। প্রিয়নাথ এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তারই মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে পত্রবিনিময় করছেন, ভারতীয় ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করছেন। ১৮৮৫-তে চুঁচুড়া ছেড়ে তিনি চলে গেলেন বোম্বে। ইচ্ছে ছিল জীবনের শেষ কটা দিন আরব সাগরের তীরেই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু আবহাওয়া সহ্য হল না। ফিরে আসতে হল চুঁচুড়ায়। একটু সুস্থ হতেই কলকাতায় চৌরঙ্গীতে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর বাড়িতে নিয়ে এলেন দেবেন্দ্রনাথকে। সৌদামিনী দেবীর শুশ্রূষায় ক্রমশ আরোগ্য লাভ করলেন। এই পর্বের স্মৃতিটি অবনীন্দ্রনাথ বড় সুন্দরভাবে বলে গেছেন : ''বড়োপিসিমা তাঁর সেবা করতেন। তিনি জানতেন কর্তাদাদামশায়ের পছন্দ-অপছন্দ। আহা, বেচারি বড়োপিসিমা, বিধবা ছিলেন তিনি, কী নিখুঁত সেবা, আর কী ভালোবাসা বাপের জন্য—অমন আর দেখা যায় না।''[২০]

কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ, যা আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হল, তার প্রচার ও প্রসার নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ কোনওদিনই বিশেষ মাথা ঘামাননি। মুষ্টিমেয় কিছু অনুরাগী এবং নিজের পরিবারের মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল সেটি। কিন্তু কলকাতার সমাজজীবনে তিনি শ্রদ্ধার উঁচু আসনেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশেষত ধর্মতত্ত্বে যাঁদের একনিষ্ঠ কৌতূহল, সেইসব মগ্ন সাধক অনেক সময়েই তাঁর সান্নিধ্যে অনুপ্রেরণা পেতেন।

একদিন এক উজ্জ্বল যুবক তাঁর কাছে এলেন। বড় নাতি দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনি সহপাঠী। তাঁর সাধনার ঐকান্তিকতা দেবেন্দ্রনাথকে বিস্মিত করল। তিনি তাঁকে বললেন, ''তোমাতে যোগীর লক্ষণ-সকল প্রকাশিত আছে; তুমি ধ্যানাভ্যাস করলে যোগশাস্ত্রনির্দিষ্ট ফলসকল শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করবে।''

ইনিই নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর মন তখন ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান, আবাল্যলালিত বিশ্বাসের টানাপোড়েনে অশান্ত। শান্তির খোঁজে ব্রাহ্মসমাজে

যাতায়াত করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তখনও তাঁর দিব্যমিলন ঘটেনি। দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহ করতেন এই তরুণ যোগীকে। তাঁর উৎসাহ এবং প্রেরণাতেই নরেন্দ্রনাথ আরও বেশি ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়লেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের পুনর্মিলন ঘটে ১৮৯৯-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি। সেই মিলনের সেতুবন্ধনের দুরূহ কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল ভগিনী নিবেদিতার সাগ্রহ প্রয়াসে।

তার পাঁচদিন আগেই ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে নিবেদিতার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্লেগ-মহামারির সময় এই মহীয়সীর আত্মত্যাগের কথা দেবেন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই ঠাকুরবাড়ির অন্য সদস্যদের সঙ্গে নিবেদিতার সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়েছিল। নিবেদিতার সঙ্গে আলাপে স্বামীজীর প্রসঙ্গ উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই দেবেন্দ্রনাথ স্বামীজীকে দেখার জন্য অধীর হয়ে ওঠেন। অবশেষে স্বামীজীর আগমন ঘটে মহর্ষির জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। নিবেদিতার ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯-এর পত্র থেকে জানা যায়, স্বামীজী নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে জোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলেন। মহর্ষিকে প্রণাম করে স্বামীজী একটি গোলাপের তোড়া নিবেদন করেন। তাঁরা দুজন প্রায় মিনিট দশেক বাংলায় কথা বলেন। মহর্ষির কথা শেষ হলে স্বামীজী বিনীতভাবে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

‘ক্লান্ত বাঁশীর শেষ রাগিণী’

শরীর একটু সুস্থ বোধ হতেই দেবেন্দ্রনাথ আবার বায়না ধরলেন দার্জিলিং যাওয়ার। নীলমাধব ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে দীপেন্দ্রনাথ চললেন তাঁর সঙ্গে। হাওয়া বদলের এই তাঁর শেষ নেশা। লাবণ্যপ্রভা সরকারের স্মৃতিচারণায় মহর্ষির এই শেষভ্রমণের দিনগুলির কথা জানা যায়। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন তাঁদের বাড়িতে বসে দেবেন্দ্রনাথ তাঁদেরকে শোনাচ্ছেন তাঁর উপার্জিত সত্যের কথা :

‘‘গভীররূপে চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে দেখি পৃথিবীতে আমার আত্মার শিক্ষা এখনও সমাপ্ত হয় নাই তাহা সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর এখনও আমায় পৃথিবীতে রাখিয়াছেন এবং বারবার মৃত্যুমুখে ফেলিয়া আসন্ন কালের কথা স্মরণ করাইয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে আমায় অবসর দিতেছেন।’’[২১]

দার্জিলিং-এর আবহাওয়া সহ্য হল না বেশিদিন। নামিয়ে আনা হল তাঁকে। রাখা হল পার্ক স্ট্রিটের এক বড় বাড়িতে। আত্মীয়পরিজন বন্ধুবান্ধব সকলের আসাযাওয়ায় গমগম করতে লাগল সে-বাড়ি। সৌদামিনী দেবীর ওপরেই রইল সেবার ভার। চাকর-বাকর রইল অনেক।

এভাবেই কাটিয়ে দিলেন শেষ কয়েকটা বছর। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির স্থাপনার জন্য সাতহাজার টাকা দান করলেন। নাতি বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে গভীরভাবে মুষড়ে পড়লেন। নাতবউ সাহানার পুনর্বিবাহের আয়োজন হচ্ছে শুনতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্রনাথকে পাঠালেন এলাহাবাদে। বন্ধ করে দিলেন তার পুনর্বিবাহ।

সেই বৃদ্ধ বয়সেও দেবেন্দ্রনাথ বিষয়-সম্পত্তির হিসেব জানতে চাইতেন। খোঁজ রাখতেন জমিদারির আয়-ব্যয়ের। মাসের প্রথম দিনটি এলেই নিয়ম করে হিসেবপত্র নিয়ে বসে পড়তেন। অথচ তিনিই যখন ধ্যানে বসছেন তখন হারিয়ে ফেলছেন বাহ্য চেতনা। ঈশ্বর-উপলব্ধির নিবিড় সাধনায় মগ্ন থাকছেন যিনি, তিনিই আবার খবর নিচ্ছেন পোষ্য গাভীটিকে দুধ খাওয়ানো হল কি না। শৌখিন মেজাজটি বজায় রাখছেন, পাশাপাশি অন্তহীন উৎসাহ দেখাচ্ছেন ধর্মালোচনাতেও। বিষয়সম্পত্তির উইল করছেন। শান্তিনিকেতনকে ট্রাস্ট সম্পত্তি করে দিচ্ছেন। আবার বাঙালির ভাবালুতা আর ঈশ্বরভাবনার সঙ্গে পরিচয়সূত্রেই রবীন্দ্রনাথকে

শান্তিনিকেতনে ছাতিমতলা

স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছেন, শান্তিনিকেতনে যেন তাঁর কোনও সমাধিমন্দির নির্মিত না হয়। ব্রহ্মচিন্তায় যেন ব্যক্তির প্রভাব বড় হয়ে না দাঁড়ায়।

শেষদিকে শরীর আরও ভেঙে পড়ল। কথা বলার শক্তিও প্রায় হারিয়ে ফেললেন। বুকে ফোড়া হল। তার অস্ত্রোপচারে আরও দুর্বল হয়ে গেলেন। নিজেও বুঝতে পারছিলেন সমুখেই শান্তিপারাবার। প্রতিদিন সকালে তাঁকে পুবমুখো করে বসিয়ে দিতে হত। উদীয়মান সূর্যের দিকে চেয়ে নিমগ্ন হতেন গভীর ধ্যানে। এভাবেই পুণ্য মাঘ মাসে চেয়ারে বসে থাকতে থাকতেই দেবেন্দ্রনাথ চলে গেলেন অমৃতধামে। সেদিন ১৯ জানুয়ারি ১৯০৫।

অনিঃশেষ ব্যথা

নানা বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ উত্তাল উনিশ শতকের বুকে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন 'মহর্ষি'। ঋষির মতোই দুই যুগের মাঝে দাঁড়িয়ে যিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন প্রবল দ্বন্দ্বে আলোড়িত এক সংক্ষুব্ধ প্রহরকে স্থির প্রজ্ঞায়। অবিচলিত আদর্শে বিলাস-বৈভব-প্রাচুর্যের জগতকে হেলায় ত্যাগ করতে পেরেছিলেন ঈশ্বরের স্বরূপসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে। নানা মত ও পথের গোলকধাঁধা থেকে মানুষকে যথার্থ ধর্মজিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ করে তাদের আত্মিক উন্নতি সাধন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। চেয়েছিলেন স্বদেশের ধর্ম-ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে বিজাতীয় এবং বিদেশীয় আক্রমণ থেকে সর্বান্তঃকরণে রক্ষা করতে, বেদ-উপনিষদের তত্ত্বকে নিবিড়ভাবে অনুশীলন করে তাকে যুগোপযোগী বিন্যাস দিতে, আবার বাংলাভাষাকে পরিপুষ্ট করে তাকে 'কৈশোরে উত্তীর্ণ' করে দিতে। দেবেন্দ্রনাথ নিজের চেতনায় ঈশ্বরের অপার সান্নিধ্য অনুভব করতে চেয়েছিলেন জ্ঞানের পথে, সাধনার পথে। যথার্থই তিনি সেই মহান পুরুষ—যিনি, রবীন্দ্রনাথের কথা ধার করে বলা যায়, 'আধুনিক বিষয়লুব্ধ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।' বাধার বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করেছেন; স্বজনবিচ্ছেদে কাতর হয়েছেন, নিন্দা-সমালোচনায় বিদ্ধ হয়েছেন, বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণায় মর্মান্তিক আঘাত সহ্য করেছেন, তবু সত্যনিষ্ঠায় অবিচল থেকেছেন। ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন থেকে জগতের সার সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। আপস করেননি মতের সঙ্গে, পথের সঙ্গে। নিঃসঙ্গ সাধকের মতো ব্রহ্মের সন্ধান করেছেন। তার উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন। ভারতবর্ষের ধর্মসাধনার ইতিবৃত্ত সমৃদ্ধ করেছেন নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে।

তথ্যসূত্র

১৮। অজিতকুমার চক্রবর্তী, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর* (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি : কলকাতা, ২০১৩), পৃঃ ৪৭৭

১৯। তদেব, পৃঃ ৪৭৭-৪৭৮

২০। শ্রীমতী রাণী চন্দ, *ঘরোয়া অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর* (বিশ্বভারতী : কলকাতা, ১৩৯৮), পৃঃ ৫৬

২১। *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*, পৃঃ ৫৮৩